পরিক্রমা

প্রতীক্ষা

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে স্বদেশে ও বিদেশে বিচিত্র ভাবনার বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁর মর্ত্যতনু ত্যাগে মনে হল একটি স্বর্ণোজ্জ্বল পটের দ্যুতি হঠাৎ কালগর্ভে লীন হল। কিন্তু কয়েক যুগের ছবি যাঁর সামনে ভেসে উঠেছিল তাঁর পরিকল্পনার গভীরতার ও ব্যাপকতার পরিমাপ কে করবে! সে যে কালের নিরিখে শাশ্বত! সে-পরিকল্পনা ছিল বিশ্বজোড়া। বিশ্বের কোণে কোণে সকল মানুষের জন্য। মানুষই তাঁর উপাস্য নারায়ণ। মানুষের অন্তরের গভীর রহস্যে প্রবেশ করতে তিনিও ইতস্তত করতেন। মনে পড়ছে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের কাছে যখন তিনি বিদায় গ্রহণ করছেন, সেই ভারতপ্রেমী বিদেশি পণ্ডিতের আন্তররাজ্যে দৃষ্টিপাত করতেও যেন তিনি কুণ্ঠিত। মানুষের প্রতি তাঁর অখণ্ড শ্রদ্ধা।

বিবেকানন্দের জীবনের দিকে তাকালে দেখি কী প্রবল সংগ্রাম তাঁকে ঘিরে ছিল! তাঁর অতিমানসের আলোড়ন, আধ্যাত্মিক স্তরে নিরন্তর জিজ্ঞাসা তো ছিলই কিন্তু বহির্জগতে এক বিচিত্র স্বার্থপর মলিন চেতনার সংস্পর্শ তাঁকে অহরহ দীর্ণ-বিদীর্ণ করেছে। তাঁর মহৎ উদার সংস্কারমুক্ত সাহসী চিত্তও সন্তপ্ত। তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন অন্তরস্থিত দেবতার এবং খাঁটি অকপট মানুষের। মনুষ্যত্বহীন মানুষের সংখ্যা আজ যেন ক্রমবর্ধমান। ধন-জন-ঐশ্বর্য সবই আছে, শুধু মানুষের মধ্যে ক্ষীণ হয়ে গেছে মনুষ্যত্ব। সাততলা প্রাসাদের পাশে ঝুপড়িবাসীর অভুক্ত দীন মুখ। বিবেকবুদ্ধিরহিত মানুষের অঢেল বিলাস-ব্যসন।

অবতার বা অবতারকল্প পুরুষ আসেন জগতের রূপান্তর ঘটাতে। পুরোনোকে ভিত্তি করে নতুন ইমারত গড়তে। এবার তাঁরা এসেছেন সাধারণ মানুষের মধ্যেও সাধারণ হয়ে, কিন্তু চরিত্রের বনেদিয়ানায় ছাপিয়ে গেছেন রাজা-রাজড়া কেন সম্রাটকেও। এযুগে তাঁদের কৃপাদৃষ্টি লক্ষ লক্ষ সাধারণ দরিদ্র, অত্যাচারিত মানুষের ওপর, যারা চিরদিন বঞ্চিত ও অবহেলিত হয়েছে সমাজে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও জাতপাতের বেড়া ভেঙে সমাজে হরিনাম সংকীর্তনের মাহাত্ম্য দেখিয়েছিলেন। ভগবানের নামেই মানুষ শুচিশুদ্ধ। কিন্তু সেই ভক্তিভাবে আবিষ্ট মানুষ বিশেষ করে বাংলা, ওড়িশা ও দক্ষিণের কোনও কোনও প্রদেশে ও উত্তরভারতে তখন ছড়িয়ে ছিল। এবারের লীলা বিশ্বপ্লাবিনী। তখন বিজ্ঞান-চেতনার নতুন যুগ। মানুষ জাগতিক উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্যকেই মূল্য দিয়ে পাশ্চাত্যদেশের অভিমুখী। এদেশের ধর্মীয় পরিবেশে স্বামীজী তাঁর নতুন ভাবনাগুলি একটা বিশেষ পরিমণ্ডলে প্রচার করেছিলেন। বিদেশে ধর্মপ্রচার? আগ্রাসী খ্রিস্টান ধর্মের সামনে ভারতের সনাতন ধর্মভাবের বীজ ছড়ানো যেন স্বপ্নের মতোই অবাস্তব বোধ হয়। অথচ সেই কঠিন কাজটিই তিনি করেছিলেন একক প্রচেষ্টায়। বীজ ছড়িয়ে এলেন পাথুরে মাটিতে, বরফের রাজত্বে— অঙ্কুরোদ্গমের অপেক্ষা না করেই।

আজ মহাকাল সেই কালোত্তীর্ণ অথচ নবীন

ভাবনাকে ভাসিয়ে আনছে যুগের তটে। স্বামীজীর বড় ভাবনা হয়েছিল গুরুভাই স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কথা শুনে, যিনি সংশয় তুলেছিলেন দেশ কেন তাঁর ভাব নেবে—কিন্তু 'দেশ তোমার কথা নিশ্চয়ই নেবে' বলে আশ্বস্ত করেছিলেন অপর এক গুরুভাই। আজ মনে হচ্ছে দেশ কেন, সারা বিশ্বই বিবেকানন্দ-বাণীকে জান্তে অজান্তে গ্রহণে উৎসুক। এ বাণীময় এক মহাশক্তি—বিবেকানন্দের মুখ থেকে ঝরে শক্তিবীজ বপন করে গেছে। মনুষ্যত্ব, চারিত্র্যশক্তি এবং আধ্যাত্মিকতা—এ-তিন ভাবের স্ফুরণ ঘটতে চলেছে বিশ্বজুড়ে। ভেদাভেদ নাশকারী এই বাণীরূপ ব্রহ্মাস্ত্র উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল ১৮৯৩-তে। তার অমোঘ প্রভাব থেকে মানুষের মুক্তি নেই। নতুন মানুষ গড়ার এ যেন পারমাণবিক সৃষ্টিশক্তি—যা ধ্বংস করে না, তিল তিল করে রচনা করে মানুষের হৃদয়ে মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের বেদি। সেই বেদি আলোকিত হয় একম্ অদ্বিতীয়ম্-এর মহাদ্যুতিতে।

''ঝরে যে ফুল ধূলায় জানি হয় না তাহা হারা।
ওই ঝরা ফুলে নেয় যে জনম তরুণ তরুর চারা।''

স্বামীজী শুধু দিয়েছিলেন—সূর্য যেমন আলো দেয়, মেঘ যেমন বর্ষণ করে, ফুলের সুগন্ধ যেমন ছড়িয়ে পড়ে—তেমনি করেই তাঁর কণ্ঠে বাণী ঝরেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার নরেন্দ্রনাথকে অনবরত কথা বলতে শুনে বলেছিলেন, ''খুব বকতে পারে।'' অন্যদিকে নরেন্দ্রের সুরতাল-লয়সমন্বিত সংগীত শুনে তিনি সমাধিস্থ হতেন, অন্য শ্রোতারা মোহিত হতেন। ওই অপূর্ব কণ্ঠস্বর যে কোনওদিন বিশ্বরঙ্গমঞ্চ থেকে উদ্‌গীত হয়ে সাত হাজার শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করবে, তা কে-ই বা সেদিন কল্পনা করেছিল! কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের হাতে লেখা 'নরেন শিক্ষে দিবে' বাক্যটির অন্তর্নিহিত বিপুল রহস্য সেদিন সত্য হয়েছিল। স্বামীজীর বাগ্‌বিক্রমে বেদান্তের সিংহনাদ বেজে উঠেছিল পাশ্চাত্যের আকাশ-বাতাস মথিত করে।

স্বামীজী বিশ্বমহাসভায় একাকী নিজ মহিমায় দাঁড়িয়েছিলেন। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে মারের এক সৈন্য বলেছিল,

সূর্যস্য লোকে ন সহায়কৃত্যং
চন্দ্রস্য সিংহস্য চ চক্রবর্তিনঃ।
বোধৌ নিষণ্ণস্য চ নিশ্চিতস্য
ন বোধিসত্ত্বস্য সহায়কৃত্যম্॥

(ললিতবিস্তর, বুদ্ধচরিত, ১৩ সর্গ)

—সূর্য, চন্দ্র আলো দানের জন্য অপরের সাহায্য চান না। সিংহ নিজ বীর্য নিয়ে একাকী ঝাঁপিয়ে পড়ে—কারও সাহায্য চায় না, আর রাজচক্রবর্তীর সম্পদের অভাব নেই, তিনিও সাহায্য চান না। বুদ্ধত্ব লাভ করবার জন্য যিনি বদ্ধপরিকর সেই স্থিরযোগী বোধিসত্ত্বেরও কোনও সাহায্য লাগে না।

বুদ্ধদেবের সংগ্রাম ছিল মারসৈন্যের সঙ্গে। এবারে স্বামীজীর মহাসংগ্রাম রজোগুণের প্রাচুর্যে বলবান, বিত্তবান জড়বিজ্ঞানের পুরোধাদের সঙ্গে। ভারতের নিঃস্ব সন্ন্যাসী নিয়ে গিয়েছিলেন সনাতন ভারতের অধ্যাত্মসম্পদ। দুহাতে সেই সম্পদ বিতরণ করেছেন তথাকথিত ম্লেচ্ছ নরনারীর মধ্যে। ধনকুবেরের দেশ তাঁর বক্তৃতা বেচে অর্থ লাভ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। কোথায় ধর্ম? কাদের কাছে ছড়িয়েছেন অমূল্য রত্নধন! ভারতের মান রাখতে বিদেশ বিভুঁইয়ে এইরকম সংগ্রামের কোনও ইতিহাস নেই। সে-সংগ্রামে তিনি সূর্যোপম একাকী—সহায়তা কোথায়? একাই নতুন দেশে অপরিচিতদের মধ্যে তিনি হেঁটে চলেছেন শুধু নয়, দিয়ে চলেছেন সম্রাটের মতন।

সেই রাজভিখারিকে যাঁরাই ভিক্ষাদান করেছেন, তাঁরাই রূপান্তরিত হয়েছেন। দেশ-জাতি-সংস্কারের ঊর্ধ্বে মানবচেতনার উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছেন। থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড বা হাজার দ্বীপের জন্মলগ্নে এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ আনলেন আধ্যাত্মিক বিপর্যয়—''এই দৈবীশক্তি-

সম্পন্ন পুরুষ থেকে যে শক্তি নির্গত হত তা এতই প্রবল ছিল যে সকলে যেন তার সংস্পর্শে আসতে ভীত সন্ত্রস্ত হত। এ যেন একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যেত।" সহস্র দ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর সান্নিধ্যে সাতসপ্তাহ শ্রোতাদের স্মৃতিতে দ্যুতির মতন ছিল। তাঁরা জগতে থেকেও জগতকে ভুলেছিলেন। মহামানবদের কথায় ভরা স্বামীজীর সে-দেববাণী যেন অফুরন্ত প্রেরণার উৎস।

চেতনার গভীর থেকে স্বামীজীর বাণী উঠত যা ছিল অপ্রতিহত। সত্তা ভেদ করে তা অন্তরে প্রবিষ্ট হত। এ-পরিচয় স্বামীজীর বহু পাশ্চাত্য অনুরাগী পেয়েছিলেন। তাঁদের কাছে বুদ্ধ, খ্রিস্ট ও বিবেকানন্দ একীভূত হয়েছিলেন।

স্বামীজীর আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পরম উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। স্থলে-জলে তাঁর জয়পতাকা উড়িয়ে আনন্দোৎসব চলছে। বিদেশেও তাঁর ভাবের অঙ্কুরোদ্গম হয়ে চলেছে যা পাশ্চাত্যকে অধ্যাত্মমুখী করবে—এ-সত্য দর্শন করেছিলেন স্বামীজী। অন্যদিকে ভারত বৈষয়িক দিকে উন্নতির চূড়ায় অবস্থান করবে—আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে ফিরে পাবে প্রাচীন অভ্যুদয়ের গৌরব। এখন ক্রান্তিকাল, উত্তরণের যুগ। স্বামী বিবেকানন্দের পতাকা তুলে দেওয়া হচ্ছে অগণিত মানুষ, বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মের হাতে। স্বামীজী একবার আমেরিকা থেকে কৌতুক করে গুরুভাইদের লিখেছিলেন, ''আজকাল গোঁড়া বেটাদের ত্রাহি-ত্রাহি এদেশে।... গুরুর কৃপায় যে আগুন ধরে গেছে, তা নিভবার নয়। কালে গোঁড়াদের দম নিকলে যাবে। কি বাঘ ঘরে ঢুকিয়েছেন, তা বাছাধনরা টের পাচ্ছেন।... এরা আমাতে এক নূতন ডৌলের মানুষ দেখেছে।... এখন সকলে বড়ই ভক্তি করছে—বাবা ব্রহ্মচর্যের চেয়ে কি আর বল আছে?"

সমাজকে পাশ্চাত্য যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে সে অতি অনুদার। তাই সেখানে ধর্ম নিতান্ত অপরিণত, সমাজ কিন্তু চমৎকার উন্নত। ভারতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্মকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। ধর্ম তাই অতি উন্নত ও বিকশিত হয়েছে। তাঁরা কিন্তু সমাজকে সে-স্বাধীনতা না দিয়ে নিয়মের নিগড়ে বাঁধলেন, ফলে সমাজের বিকাশ রুদ্ধ হল।

এখন পটপরিবর্তন হতে চলেছে। প্রাচ্যে সমাজের চরণের শৃঙ্খল ভাঙছে, পাশ্চাত্যেও ধর্মের চারিদিকে গোঁড়ামির প্রাচীর ভগ্নপ্রায়। এ-নতুন বার্তা নিয়েই এযুগের আচার্যের আবির্ভাব এবং কৌতুক করে তারই বর্ণনা গুরুভাইয়ের কাছে : ''এদেশে কার্যের বিরাম নাই—সমস্ত দেশ দাবড়ে বেড়াচ্ছি। যেখানে তাঁর তেজের বীজ পড়বে, সেইখানেই ফল ফলবে—অদ্য বা শতাব্দান্তে বা।"

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নতুন সরণি ও ক্ষেত্র স্বামীজী প্রস্তুত করলেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় ব্যয় করে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচণ্ড তেজসম্পন্ন ভাবের বীজ বপন করা সেদিন সহজ ছিল না। আজ শতাব্দী পেরিয়ে আমরা দেখছি কেমন করে ভারতীয় সমাজের রুদ্ধদ্বারগুলি উন্মুক্ত হয়েছে, জাতপাতের বাধাগুলি কেমন করে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে—নতুন ভারতের অভ্যুদয় ঘটছে। পশ্চিমের ধর্মেও উদারতার বন্যা আসছে—অমৃতের পুত্রেরা যুগের ঋষির আহ্বানে চোখ মেলছে। শুধু নতুন ভারত কেন, নতুন বিশ্ব জাগছে আলোকের ধারায় স্নাত হয়ে।

এবার সোনার ফসল ফলবে। আমরা শুধু আবাহন করি জীবে জীবে নিহিত সর্বশক্তিমান মহান আত্মাকে, আবাহন করি বোধির উদার আলো যা অসতের তমো দূর করবে—প্রকাশ করবে অবিনশ্বর সত্য ও জ্যোতির তোরণ।